The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 77 - 90)
Published in November 2024

বৌদ্ধ দর্শনে কর্মতত্ত্ব এবং প্রাত্যহিক জীবনে কর্মের প্রভাব

ড. সুদীপ্তা বড়ুয়া [*]

প্রতিপাদ্যসার: বৌদ্ধদর্শনে কর্মবাদ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।। জীব জগৎ কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ করে মানব জীবন। এই মতবাদ বৌদ্ধদর্শনের মূল ভিত্তি চতুরার্য সত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যাত। চারি আর্যসত্য যথা - দুঃখ, দুঃখ সমূদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়- এই চারি আর্যসত্যের দ্বিতীয় আর্যসত্য 'দুঃখ সমূদয়' বা দুঃখের কারণ সত্য। দুঃখের কারণ জন্ম, জন্ম হলেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয় বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, পঞ্চোপদানস্কন্ধ দুঃখের উৎপত্তি। জন্মের কারণ তৃষ্ণা ও অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে জীব ভালোমন্দ, সত্যাসত্য জ্ঞানের অভাবে তৃষ্ণা বা কামনা বাসনায় আকৃষ্ট হয়ে কায়-বাক্য-মনো দ্বারে অকুশল কর্ম সম্পাদন করে, ফলে তাকে তার সৃষ্ট কর্মের ফল ভোগ করার জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তথ্য উপাত্তগুলোতে প্রাথমিক উৎস এবং দ্বৈতীয়িক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তগুলো পালি ভাষায় লেখা, তবে সব গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ রয়েছে। এছাড়া দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধদর্শনে কর্মতত্ত্ব একটি জটিল বিষয়। মানবজীবন কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণ কী ভাবে হয়, প্রক্রিয়া কী, কর্মের শ্রেণিবিভাগ এবং কোনো কর্ম কখন এবং কীভাবে ফল প্রদান করে এবং প্রাত্যহিক জীবনে কর্মের প্রভাব কতটুকু প্রতিফলিত হয় তা বুদ্ধ কর্তৃক পিটকীয় গ্রন্থে বর্ণিত এবং বিভিন্ন পণ্ডিত গবেষকদের আলোচনার সূত্র নিয়ে আলোচ্য নিবন্ধে বৌদ্ধ কর্মতত্ত্বের পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ কর্মতত্ত্বের সপক্ষে যাঁরা যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভদন্ত নাগসেন ও গ্রীকরাজ মিলিন্দের কথোপকথন, জ্যোতি:পাল মহাথের, ড. সুকোমল চৌধুরী, Na-Rangsi, Payutto Bhikkhu P.A প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকা :

বৌদ্ধদর্শনে কর্মতত্ত্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। মানবজাতির অস্তিত্বের বিকাশ থেকে মানবগণ চেষ্টা করে আসছে মানবে মানবে এত বৈষম্য কেন? কেউ ভোগ ঐশ্বর্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, আবার কেউ নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে সীমাহীন দুর্বিষহ জীবন কাটায়, কেউ স্বাস্থ্যবান, কেউ রুগ্ন, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা, কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, কেউ জ্ঞানী, কেউ মূর্খ, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী এই বৈষম্যের কারণ কী? এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন ধর্মমতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। কারো কারো মতে কোনো অদৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এই বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন। আবার কারো কারো মতে এ বৈষম্য জগতে স্বাভাবিক গতি। বৌদ্ধদর্শন কিন্তু এ বৈষম্যের কারণ সম্পর্কে একটি যুক্তিসঙ্গত সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয়

[*] সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

'কর্মতত্ত্ব'। কর্মকে মানসিক কার্য-কারণ বিধি বলা যায়। কর্মের অনুসিদ্ধান্ত হলো পুনর্জন্ম। কর্ম এবং পুনর্জন্ম পরস্পর পরিপূরক। বুদ্ধ পূর্ব যুগেও কর্ম ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা ও বিভিন মতবাদ প্রচলন ছিল। কিন্তু বুদ্ধই সর্বপ্রথম এই মতবাদের একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

'কর্ম শব্দের অর্থ'

সংস্কৃত শব্দ 'কর্ম'-কে পালি ভাষায় 'কম্ম' বলা হয়। ক + মন থেকে কর্ম শব্দের উৎপত্তি। কর্ম বা কম্ম শব্দের আভিধানিক অর্থ কাজ, ক্রিয়া, কর্তব্য, বৃত্তি, যা করা হয়, কার্য (Mahathera 78) ইত্যাদি। কর্ম হলো কর্তা যা করে তাই কর্ম। বৌদ্ধদর্শনে কর্মের সংজ্ঞা আরো বিস্তৃত এবং বহুমাত্রিক। বৌদ্ধদর্শনে কর্ম বলতে কর্তার কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ইচ্ছাকৃত ভালো-মন্দ যে কোনো কাজকে বুঝায়। এখানে 'কর্ম'-র মূল উৎস হলো কর্তার 'মন'। কায়-বাক্য হলো এর অনুষঙ্গী। বুদ্ধ *'অঙ্গুত্তর নিকায়'* গ্রন্থে বলেছেন, ' চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি, চেতযিত্বা কম্মং করোতি কাযেন, বাচায, মনসা একায চেতনায এক পটিসন্ধিং' (করুণাবংশ ভিক্ষু ৩০২)।

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! আমি ইচ্ছা বা চেতনাকেই কর্ম বলি, ইচ্ছা প্রণোদিত বা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে। একটি চেতনা একটি প্রতিসন্ধি।

কর্ম সম্পন্ন করতে মনের ভূমিকা মুখ্য। চিত্ত বা মন যখন অরক্ষিত থাকে তখন কায় অরক্ষিত থাকে, বাক্য অসংযত থাকে, চিন্তাও থাকে অসংযত। পক্ষান্তরে চিত্ত যখন সুরক্ষিত থাকে তখন কায়-বাক্য-চিত্ত থাকে সুরক্ষিত। সেজন্য বুদ্ধ বলেন, মন হলো সমস্ত ভালো এবং খারাপ অবস্থার পূর্বগামী (পূর্বসূরী)। কেউ যদি অকুশল চিত্তে কোনো কথা বলে বা কাজ করে তাহলে দুঃখ শকটের চাকা যেমন ভারবাহী বলীবর্দের পদানুসরণ করে আবর্তিত হয়, তেমনি দুঃখও তাকে অনুসরণ করে। আর যদি কেউ প্রসন্ন মনে বা কুশল চিত্তে কথা বলে বা কাজ করে তাহলে সুখ তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে।[১] অতএব কর্ম বলতে মন বা চিত্ত দ্বারা যা চিন্তন বা মনন করা হয় এবং চিত্ত প্রসূত কায়িক ও বাচনিক ভালো মন্দ কুশলাকুশল প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়।

কর্ম ও বিপাক

কর্ম হলো কাজ এবং বিপাক হলো কাজের ফল, পরিণতি বা পরিণাম। কর্ম যদি কুশল হয় বিপাকও কুশল বা ভালো হয় আর কর্ম যদি অকুশল হয় তাহলে বিপাকও অকুশল বা খারাপ হয়। কর্মের - এ বিধান অখণ্ডনীয়। কর্ম ও বিপাককে বস্তুর ছায়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। প্রতিটি বস্তুর যেমন ছায়া থাকে, তেমন প্রতিটি কর্মের বিপাক থাকে। ছায়া যেমন বস্তুকে অনুসরণ করে তেমন বিপাকও কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম থেকে কর্ম বিপাকের উৎপত্তি। কর্ম ও বিপাক সম্পর্কে আচার্য বুদ্ধঘোষ *বিশুদ্ধিমাগ* গ্রন্থে বলেন,

> Kamma-result proceeds from kamma, Result has kamma for its source, Future becoming springs from kamma, And this is how the world goes round (Translated by Nonamoli Bhikkhu).

উপযুক্ত সময় ফল প্রদানই কর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি। সত্ত্বগণ কুশলকর্মের ফলস্বরূপ ইহজীবনে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু প্রভৃতি লাভ করে, আবার অকুশল কর্মের কারণে দারিদ্রতা, কুৎসিত রূপ, অল্পায়ু প্রভৃতি ভোগ করে (চৌধুরী ১২৭) । কর্ম ও বিপাককে বুদ্ধ বীজ ও ফল এর সাথে তুলনা করেছেন –

যাদিসং বপতে বীজং, তাদিসং হরতে ফলং, কল্যাণকারী কল্যাণং, পাপকারী চ পাপকং *(সংযুক্ত নিকায়ো*, পঠমো ভাগো ১৮৭) ।

অর্থাৎ যেমন বীজ বপন করবে তেমন ফল ভোগ করবে, কল্যাণকারী মঙ্গল ফল এবং পাপী অমঙ্গল ফল ভোগ করে।

কর্মের কারণ

মানুষের জীবন হচ্ছে কর্মময়। কর্মহীন মানুষ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। এ কর্ম সংঘটিত হয় দুটি কারণে। প্রথম ও প্রধান কারণ অবিদ্যা এবং দ্বিতীয় কারণ তৃষ্ণা। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে প্রতিনিয়ত কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করে। যার ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তর দুঃখ ভোগ করে।

অবিদ্যা ও তৃষ্ণা হলো সমস্ত অকুশল কর্মের কারণ। কুশল কর্মকেও কর্ম নামে অভিহিত করা হয়। কেননা কুশল কর্মের মূল অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ হলেও এরূপ কর্মে অবিদ্যা ও তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে। শুধুমাত্র লোকোত্তর মার্গচিত্তে কোনো কিছু করা হলে তাকে কর্ম বলা যায় না। কারণ এরূপ কর্ম অবিদ্যা ও তৃষ্ণা ধ্বংসের জন্য নিযুক্ত হয় (চৌধুরী ১২৬) ।

কর্মের অবস্থান

মানুষ যে কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করে তা শরীরে বা শরীরের বাইরে কোনো অংশে সঞ্চিত থাকে না। কেননা বৌদ্ধ দর্শন মতে জীব হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) সমষ্টি। পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়ে গঠিত সতত পরিবর্তনশীল দেহের ভিতরে বা বাইরে কোথাও কোনো পাত্র বা ভাণ্ড নেই যেখানে কর্ম সঞ্চিত থাকে। তাহলে মানুষের কৃত কর্মগুলো কোথায় অবস্থান করে ? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় রাজা মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের কথোপকথনে (ধর্মাধার মহাস্থবির ৭৮)।

রাজা মিলিন্দ জিজ্ঞেস করেন, ভন্তে নাগসেন! নাম-রূপ দ্বারা কৃত কর্মরাশি কোথায় অবস্থান করে? উত্তরে ভদন্ত নাগসেন বলেন, মহারাজ! ভালো-মন্দ কর্মরাশি অপরিত্যাগিনী ছায়ার মত অনুসরণ করে।

রাজা মিলিন্দ আবার প্রশ্ন করেন, ভন্তে! কৃত কর্মসমূহ কী দেখতে পারা যায়? এখানে বা সেখানে অবস্থান করছে, এরূপ বলা যায় কী?

উত্তরে নাগসেন বলেন, মহারাজ! কর্মসমূহ এভাবে দেখা যায় না। যেসব বৃক্ষের ফল এখনও ফলেনি সেসকল বৃক্ষের ফলগুলো এখানে কিংবা সেখানে আছে –এভাবে যেমন দেখানো যায় না, অনুরূপ মানবের জীবন প্রবাহে কৃতকর্মসমূহকে এখানে বা সেখানে দেখতে পারা যায় না।

কর্মের কারক

মানুষের কৃত কর্মের কারক বা কর্তা কে? কে কর্মের ফল ভোগ করে? এসব গূঢ় প্রশ্নের উত্তরে আচার্য বুদ্ধঘোষ *বিশুদ্ধিমাগ* (রেবতপ্রিয় বড়ুয়া ৭৪৬) গ্রন্থে বলেন, কম্মস্স কারকো নত্থি বিপাকস্স চ ভেদকো, সুদ্ধধম্মা পবত্ততি এবে তং সম্মাদস্সনং।

– পরমার্থতঃ ভালো-মন্দ কর্মের কর্তা ও বিপাকের ভোক্তা নেই। ক্ষণ বিধ্বংস জড়-চেতনময় ধর্মপ্রবাহ কর্ম ও কর্মফলরূপে চলছে। বৌদ্ধদর্শনে এটাই সম্যকদর্শন।

সমস্ত কিছু কর্মনিয়ন্ত্রিত কিনা?

বুদ্ধ কর্মকে সত্ত্বদের সুখ-দুঃখের মূল কারণ বলে উল্লেখ করলেও তিনি একথা স্বীকার করেননি যে, জগতের সমস্ত কিছু কর্ম নিয়ন্ত্রিত। ক্ষেত্র বিশেষে সব কিছু কর্ম নিয়ন্ত্রিত নয় একথা বুদ্ধ স্বীকার করেছেন। কর্তা সুখ-দুঃখ, অসুখ- অদুঃখ যাই অনুভব করে তার জন্য কর্ম দায়ী – এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে বুদ্ধ দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন,

So, then, owing to previous action, men will become murderers, thieves, unchaste, liars, slanderers, abusive, babblers, covetous, malicious and perverse in view. Thus for those who fall back on the former deed as the essential reason, there is neither desire to do, nor effort to do, nor necessity to do this deed or abstain from that deed. (woodward 157)

সব কিছু কর্ম নিয়ন্ত্রিত হলে সত্ত্বরা কখনো কর্মজাল থেকে মুক্ত হতে পারত না। পূর্ব জন্মের কারণে যদি পরবর্তী জন্মে একই ফল লাভ করত তাহলে মন্দ লোক মন্দ হয়ে, চোর চোর হয়ে, খুনী খুনী হয়ে কিংবা ধার্মিক ধার্মিক হয়ে জন্ম গ্রহণ করত। সত্ত্বরা চাইলে পূর্ব জন্মে কৃত অকুশল কর্মের ফল পরবর্তী জীবনে স্বীয় প্রচেষ্টায় দান, শীলাদি তথা সৎকর্ম সম্পাদন করে ভবিষ্যত এবং পরজীবন সুন্দর করতে পারে। পূর্বকর্ম যদি সম্পূর্ণভাবে বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে বৌদ্ধ 'কর্মনিয়ম' অদৃষ্টবাদে কিংবা নিয়তিবাদে পর্যবসিত হতো। বৌদ্ধদর্শনে নিয়তিবাদের বা অদৃষ্টবাদের স্থান নেই (চৌধুরী ১২২)।

বৌদ্ধ দর্শন মতে জগতের জাগতিক ঘটনা প্রবাহের জন্য কর্ম নিয়মের সাথে আরো অন্যান্য নিয়ম দায়ী থাকে, যা সত্ত্বদের সঙ্গে নানান কারণে অনুষঙ্গী। বৌদ্ধদর্শন জগতের এ ঘটনা প্রবাহকে 'নিয়ম' নামে অভিহিত করে। অভিধর্ম মতে, জড় ও চেতন রাজ্যে সমস্ত ঘটনা প্রবাহের জন্য পাঁচটি নিয়ম রয়েছে। যা 'পঞ্চনিয়াম ধম্ম' নামে অভিহিত।
নিয়মগুলো হলো - ১. ঋতু নিয়ম, ২. বীজ নিয়ম ,৩. কর্ম নিয়ম ৪. অর্থ নিয়ম - ৫. চিত্ত নিয়ম (Ledi 103)

মানুষে মানুষে বৈষম্যের কারণ

সভ্যতার চরম শীর্ষে পৌঁছেও বিশ্বে সমতা বা সাম্যের কথা যতই বলা হোক না কেন, মানুষের মধ্যে দেখা যায় নানা প্রকারের বৈষম্য। এ অসমতা শুধুমাত্র ধনী-গরীবের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। এ বৈষম্যের মধ্যে আছে সুন্দর-কুৎসিত; সুস্থ-অসুস্থ; দীর্ঘায়ু-অল্পায়ু; সাধু-অসাধু; নির্বোধ-তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। মানব সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন হতে এ বৈষম্য বিদ্যমান। যা বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জগতে এ বৈষম্য দেখে (খ্রি.পূ. ৬ষ্ঠ শতকে) শুভ মানব নামক জনৈক যুবক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বৈষম্যের কারণ জিজ্ঞেস করেন, হে গৌতম, কি কারণে মানুষের মধ্যে হীনতা ও উৎকর্ষতা দেখা যায়? মানুষের মধ্যে কেউ অল্পজীবী, কেউ দীর্ঘজীবী ; কেউ দুর্বল দেহের অধিকারী, কেউ সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী ; কেউ কুৎসিত, কেউ সুশ্রী ; কেউ সামর্থ্যহীন, কেউ সামর্থ্যবান ; কেউ গরীব, কেউ ধনী ; কেউ নিম্নজাত, কেউ উচ্চজাত ; কেউ নির্বোধ, কেউ বুদ্ধিমান। (মধ্যম নিকায়, তৃতীয় ভাগ, চুল্লকর্ম বিভঙ্গ)

উত্তরে বুদ্ধ বললেন,

কম্মস্সকা মাণব, সত্তা কম্মদাযাদা কম্মযোণী কম্মবন্ধু কম্মপটিসরণা। কম্মং সত্তে বিভজতিযদিদং - হীনপ্পণীততাযাতি।

অর্থাৎ হে মাণবক! কর্ম সত্ত্বদের স্বকীয়, তারা কর্মের উত্তরাধিকারী, কর্মই প্রতিসন্ধিকারক, কর্মই বন্ধু, কর্মই আশ্রয়স্থল, কর্মই সত্ত্বগণকে হীন এবং উচ্চে বিভাজিত করে।

এ সূত্রে বুদ্ধ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বৈষম্যের কারণ হিসেবে কর্মকে নির্দেশ করেছেন। সত্ত্বগণ যে স্ব স্ব কৃতকর্মের জন্যই সুখ-দুঃখের অংশীদার – এটাই তিনি ব্যক্ত করেন।

কর্মের ত্রিদ্বার

সত্ত্বদের জীবন কর্মবহুল। কর্ম ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। গভীর নিদ্রা ছাড়া স্বপ্নে, জাগরণে বা তন্দ্রা অবস্থায় সকলেই কর্ম সম্পাদন করে। প্রতিমুহূর্তে কুশল-অকুশল এবং নিরপেক্ষ কর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বদের ধর্ম। এ কর্মসমূহ সম্পাদন করে তিনটি দ্বার -এর মাধ্যমে, যা বৌদ্ধদর্শনে 'ত্রিদ্বার' নামে অভিহিত। এ ত্রিদ্বার হলো
১. কায় দ্বার
২. বাক্য দ্বার
৩. মনো দ্বার

১. কায় দ্বার - কায় দ্বারা যেসব কর্ম সম্পন করা হয় তাকে কায় দ্বার বলে। কায় দ্বারে তিন (৩) রকমের কর্ম সম্পাদিত হয়। যেমন- হত্যা, চুরি, ব্যভিচার করা বা হত্যা, চুরি, ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা।
২. বাক্য দ্বার- বাক্যের সাহায্যে যেসব কর্ম সম্পন্ন হয় তাকে বাক্য দ্বার বলে। বাক্য দ্বারে চার (৪) রকমের কর্ম সম্পাদিত হয়। যেমন- মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, ভেদ বাক্য, বৃথা বাক্য বলা, বা সত্য বাক্য, মিলনার্থক বাক্য, মধুর বাক্য ও অর্থপূর্ণ বাক্য বলা।
৩. মনো দ্বার - মন বা চিত্তের সাহায্যে যেসব কর্ম সম্পন্ন হয় তাকে মনো কর্ম বলে। মনো দ্বারে তিন (৩) রকমের কর্ম সম্পাদিত হয়। যেমন- লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ কর্ম মনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

অতএব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মসমূহ সম্পাদন করার সময় নিজের চিত্ত ও চিত্তবৃত্তিসমূহ সর্বক্ষণ মনোনিবেশের মাধ্যমে অকুশল বৃত্তিসমূহ ত্যাগ এবং কুশল বৃত্তিসমূহকে গ্রহণ করতে হবে। যথাযথ বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যা শুভ, মঙ্গলজনক তা-ই গ্রহণ ও অনুশীলন করতে হবে। এতে করে মানুষের সৎ প্রবৃত্তিসমূহের যেমন-অলোভ, অদ্বেষ, অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা প্রভৃতির বিকাশ ঘটে এবং অসৎ প্রবৃত্তিসমূহ তিরোহিত হয়।

কর্মের শ্রেণী বিভাজন

কর্ম প্রধানত তিন প্রকার। যথা - ১. কুশল কর্ম, ২. অকুশল কর্ম এবং ৩. অব্যক্ত কর্ম।

১. কুশল কর্ম - 'কুশল' শব্দের অর্থ ভালো, সৎ, পুণ্য, ন্যায়, প্রশংসনীয়। কুশল অর্থ দাঁড়ায় পুণ্যকার্য্য, প্রশংসনীয় কার্য। যে কর্ম নিজের এবং চারপাশে বসবাসরত সবার জন্য মঙ্গলকর, কল্যাণজনক, সুখকর হয় সে কর্ম কুশল কর্ম।

২. **অকুশল কর্ম** - 'অকুশল' শব্দের অর্থ হলো পাপ, অপুণ্য, অসৎ কার্য। তাহলে অকুশল কর্মের অর্থ দাঁড়ায় অপুণ্য কার্য, পাপ কার্য। যে কর্ম নিজের এবং চারপাশে বসবাসরত সবার জন্য অশুভ ও অমঙ্গলকর হয়, সে কর্ম অকুশল কর্ম।

৩. অব্যক্ত কর্ম - কুশল-অকুশল কর্ম ছাড়া যে কর্ম সম্পাদনে কোনো পাপও হয় না পুণ্যও হয়, সে কর্মকে অব্যক্ত বা নিরপেক্ষ কর্ম বলা হয় (ব্রহ্মচারী ৩৭) ।

মধ্যম নিকায়ের 'কুক্কুরবতিক সূত্র' অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যথা: ১. কৃষ্ণ কর্ম, ২. শুক্ল কর্ম, ৩. কৃষ্ণ-শুক্ল কর্ম এবং ৪. অকৃষ্ণ-অশুক্ল কর্ম (ধর্ম্মাধার মহাস্থবির ৪৬-৫০)।

১. **কৃষ্ণ কর্ম** - যে কর্ম কর্তা হিংসাযুক্ত চিত্তে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দ্বারে সম্পন্ন করে তাকে কৃষ্ণ কর্ম বলে।

২. **শুক্ল কর্ম** - যে কর্ম কর্তা অহিংস চিত্তে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দ্বারে সম্পন্ন করে তাকে শুক্ল কর্ম বলে।

৩. **কৃষ্ণ-শুক্ল কর্ম** - যে কর্ম হিংসা-অহিংসা চিত্তে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দ্বারে সম্পন্ন হয় তাকে কৃষ্ণ-শুক্ল কর্ম বলে।

৪. **অকৃষ্ণ-অশুক্ল কর্ম** - যে কর্ম সম্পাদনে শুভ-অশুভ কোনো প্রকার ফল দান না করে কর্ম ক্ষয়ে সংবর্তিত হয় তাকে অকৃষ্ণ-অশুক্ল কর্ম বলে।

কৃত্যানুসারে কর্ম - কৃত্যানুসারে কর্ম চার প্রকার । যথা - ১. জনক কর্ম, ২. উপস্তম্ভক কর্ম, ৩. উপপীড়ক কর্ম এবং ৪. উপঘাতক কর্ম

১. জনক কর্ম

যে কর্ম কেবল প্রতিসন্ধি বা পুনর্জন্ম দেয়, জীবন প্রবাহে কোনো প্রকার ফল বা বিপাক প্রদান করে না, তাকে জনক কর্ম বলে। উদাহরণ স্বরূপ- একজন মা সন্তান প্রসব করার পর ধাত্রীকে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব দিলেন। এখানে 'মা' হলো জনক কর্ম (জিনবংশ মহাস্থবির ২০৭) ।

জনক কর্ম কুশল-অকুশল ভেদে দু'প্রকার। মরণাপন্ন ব্যক্তি ইহজীবনে যদি কোনো কুশল কিংবা অকুশল গুরুকর্ম সম্পন্ন করে তাহলে সেই গুরু কর্মই তার জনক কর্ম। আর গুরু কর্মের অভাবে আসন কর্মই জনক কর্ম নির্বাচন করে (শুভ্রা বড়ুয়া ৫৮৩) ।

২. উপস্তম্ভক কর্ম

উপস্তম্ভক শব্দের অর্থ উপকারী, সাহায্যকারী বা সহায়তাকারী। যে কর্ম জনক কর্মকে সহায়তা করে, তাকে উপস্তম্ভক কর্ম বলে (জগন্নাথ বড়ুয়া ২৪১)। জীবের গর্ভধারণের ক্ষণ হতে মৃত্যু পর্যন্ত উপস্তম্ভক কর্ম জনক কর্মকে সাহায্য করে। উপস্তম্ভক কর্ম কুশল ও অকুশল ভেদে দু'প্রকার। কুশল উপস্তম্ভক কর্ম জীবকে সুখ এবং অকুশল উপস্তম্ভক কম জীবকে দুঃখ, দুর্ভোগ প্রদান করে (চৌধুরী ১৩৭)।

৩. উপপীড়ক কর্ম

বাধাদানকারী বা উৎপীড়নকারী কর্ম। যে কর্ম অন্য কর্মকে ফল প্রদানে বাধা দেয় বা ফলকে দুর্বল করে তা উপপীড়ক কর্ম। পড়ালেখায় মনোযোগী ছাত্রের পড়াশুনা যদি অসৎ সঙ্গের সংস্পর্শে পড়ে বিঘ্নিত হয়, তাহলে এখানে অসৎ বন্ধুরা হলো ভালো ছাত্রের উপপীড়ক। কুশল উপপীড়ক কর্ম অকুশল উপস্তম্ভককে এবং অকুশল উপপীড়ক কর্ম কুশল উপস্তম্ভককে বাধা দেয়। উপপীড়ক কর্ম উপস্তম্ভক কর্মের বিপরীত। উপস্তম্ভক কর্ম কর্মের অনুকূলে এবং উপপীড়ক কর্ম কর্মের প্রতিকূলে ফল দেয় (জ্যোতি:পাল মহাথের ২৫)।

৪. উপঘাতক কর্ম

যে কর্ম অন্য দুর্বল কুশল-অকুশল কর্মের বিপাককে উচ্ছেদ করে নিজে আধিপত্য বিস্তার করে তাই উপঘাতক কর্ম। উপঘাতক কর্ম বিপরীত জাতীয় জনক কর্মকে সমূলে ধ্বংস করে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে। উপপীড়ক কর্মের ন্যায় উপঘাতক কর্মও কুশল কর্মের ফল প্রদানের সময় অকুশল কর্মের বিপাক দেওয়া এবং অকুশল কর্মের ফল প্রদানের সময় কুশল কর্মের ফল দেওয়া - এর কাজ। তবে এক্ষেত্রে উপপীড়ক কর্ম শুধু বিপরীত জাতীয় জনক কর্মকে ফল প্রদানে বাধা দেয় বা দুর্বল করে, আর উপঘাতক কর্ম কিন্তু বিপরীত জাতীয় জনক কর্মকে বিনাশ করে নিজে প্রভাব বিস্তার করে (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ২৭)। আয়ু ও কর্ম উভয় থাকা সত্ত্বেও উপঘাতক কর্ম সত্ত্বদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায়। যেমন- দুর্বৃত্তের হাতে মৃত্যু, অকস্মাৎ বজ্রপাতে মৃত্যু, দুর্ঘটনায় মৃত্যু ইত্যাদি উপঘাতক কর্মের বিপাক।

প্রতিসন্ধিক্ষণে ফল প্রদানের পর্যায় অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যথা- ১. গুরু কর্ম, ২. আসন্ন কর্ম বা মরণাসন্ন কর্ম, ৩. আচরিত কর্ম এবং ৪. উপচিত কর্ম।

১. গুরু কর্ম

যে কর্ম অন্যান্য কর্মের তুলনায় (বিপাক প্রদানের ক্ষেত্রে) গুরুতর, সাংঘাতিক, মারাত্মক তা-ই গুরু কর্ম। কুশল-অকুশল ভেদে গুরুকর্ম দু'প্রকার। কুশল গুরু কর্মকে মহদ্গাত কর্ম এবং অকুশল গুরু কর্মকে আনন্তরিক কর্ম বলা হয়।

গুরু কর্ম এতটাই শক্তিশালী যে, এ কর্ম বর্তমান থাকলে অন্যান্য কুশল-অকুশল সমস্ত কর্মকে ফল প্রদানে নিষ্ফল করে দেয়। এ কর্মের ফল অমোঘ (জিনবংশ মহাস্থবির ২০৫)। এটি (ক) কুশল ও (খ) অকুশল ভেদে দুপ্রকার। যথা

ক. কুশল গুরু কর্ম

নির্বাণ লাভের জন্য সাধককে ধ্যান-সাধনা করতে হয়। এই ধ্যান সাধনার সর্বমোট নয়টি স্তর আছে। ধ্যানের মাধ্যমে সাধক যখন অষ্ট সমাপত্তি স্তর অতিক্রম করে নবম স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি পরম সুখ নির্বাণ লাভে সক্ষম হন। চিত্ত নবম স্তরে উন্নীত হবার পূর্বে যদি সাধকের মৃত্যু হয়, তাহলে মৃত্যু মুহূর্তে ধ্যানচিত্ত যে স্তরে অবস্থান করে সে স্তরের শক্তি অনুযায়ী জনক কর্মরূপে অব্যবহিত পরবর্তী জন্মকে পরিচালিত করে। জনক কর্মরূপে ফল প্রদানকারী অষ্ট সমাপত্তির অন্যতম স্তর স্থিত এই ধ্যান চিত্তই কুশল গুরুকর্ম নামে অবিহিত (রণধীর বড়ুয়া ৪১)।

খ. অকুশল গুরু কর্ম

অকুশল কর্মসমূহের মধ্যে যে কর্মসমূহ সবচেয়ে নিকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, জঘন্য, যে কর্মের সাথে অন্য কোনো কর্মের তুলনা হয় না, তাই অকুশল গুরুকর্ম। অকুশল গুরুকর্ম পাঁচ প্রকার। যথা- ১. মাতৃ হত্যা, ২. পিতৃ হত্যা, ৩. অর্হৎ হত্যা, ৪. দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধের দেহ হতে রক্তপাত, ৫. সংঘভেদ। কেউ যদি এ কর্মসমূহের মধ্যে যে কোনো একটি কর্ম সম্পাদন করে, তাহলে সে মৃত্যুর অব্যবহিত পরজন্মে অবীচি নিরয়ে জন্ম গ্রহণ করে। (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৩৫) ।

২. আসন্ন কর্ম

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মানুষের মনে কুশল-অকুশল কর্মসমূহের মধ্যে যে কর্মের কথা চিত্তে উৎপন্ন হয়, তাই আসন্ন কর্ম। এ আসন্ন কর্ম মরণাপন্ন ব্যক্তির পরবর্তী জন্মের জন্ম-রূপ ফল প্রদান করে থাকে। এ কর্ম অন্তিমক্ষণে সর্বশেষ মনঃকর্ম (জবন চিত্ত) বলে 'আসন্ন কর্ম' নামে খ্যাত (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৩৭) ।

৩. আচরিত কর্ম

কুশল-অকুশল কর্মের মধ্যে যে কর্ম বারবার বা সর্বাধিক করা হয় সে কর্মই আচরিত কর্ম। সাধারণত যে কর্ম বারবার করা হয় তা ক্রমে স্বভাবে পর্যবসিত হয়। গুরু কর্ম এবং আসন্ন কর্মের অভাবেই আচরিত কর্ম জনক কর্মরূপে অব্যবহিত পরবর্তী জন্মে বিপাক দান করে (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৩৮) ।

৪. উপচিত কর্ম

যে সকল কর্ম গুরু, আসন্ন ও আচরিত কর্মের তুলনায় দুর্বল ও অল্প শক্তি সম্পন্ন কিন্তু ইহ ও অতীত জীবনে ধারাবাহিকভাবে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্রভাবে সম্পাদিত হয়ে চিত্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে সংখ্যাধিক্যের কারণে সর্বাধিক ফলবান হয়ে ওঠে, তাকে উপচিত কর্ম বলে (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৪০)।

ফল বা বিপাক প্রদানের সময় অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যথা ১. দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম, ২. উপপাদ্যবেদনীয় কর্ম, ৩ অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম এবং ৪. অহোসি কর্ম।

১. দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম

যে কর্মের ফল কর্তাকে কর্ম সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে বা অল্প সময়ের মধ্যে ভোগ করতে হয়, তাকে দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম বলে। দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম ইহ জীবনে ফল প্রদানে ব্যর্থ হলে, পরবর্তী জন্মে আর ফল প্রদান করতে পারে না। এ কর্ম কুশল-অকুশল দ্বিবিধ (মুৎসুদ্দি ৪১) ।

২. উপপাদ্যবেদনীয় কর্ম

যে কর্ম কর্তা ইহজীবনে সম্পাদন করে, কিন্তু তার ফল মৃত্যুর ঠিক পরবর্তী জীবনে ভোগ করে, তাকে উপপাদ্যবেদনীয় কর্ম বলা হয়। একর্ম কুশল-অকুশল দু'প্রকার। এ কর্মের ফল প্রদানের নির্দিষ্ট সময় হলো কর্তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী জন্ম। অন্যথায় এ কর্ম ফল প্রদানে ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ অহোসি কর্মে পরিণত হয়। তবে কর্তার কর্মবহুল জীবনে কুশল-অকুশল কর্মের মধ্যে যে কর্ম অধিক শক্তিশালী সে কর্মের ফল ভোগ করতে হয় (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৪২) ।

৩. অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম

যেসব কর্মের ফল কর্তাকে তৃতীয় জন্ম থেকে (বর্তমান ও অব্যবহিত পরবর্তী জন্ম) পূর্ণ মুক্তি অর্থাৎ পরিনির্বাণ লাভ না করা অবধি যে কোনো জন্মে ভোগ করতে হয়, তাকে অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম বলে (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৪৩)। এক কথায় বলা যায় অপরপর্যায়বেদনীয় কর্মের ফল অলঙ্গনীয় ও অখণ্ডনীয়। এ কর্ম এতটাই অলঙ্গনীয় যে অর্হৎ কিংবা স্বয়ং বুদ্ধও এ কর্মের ফলভোগ থেকে নিষ্কৃতি পান না।

৪. অহোসি কর্ম

যে কর্ম দুর্বলতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রদান করতে পারে না বা প্রতিকূল কর্ম শক্তির দ্বারা প্রতিহত হয়ে ফল প্রদানের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাই অহোসি কর্ম। অহোসি কর্মকে ভূতপূর্ব্ব কর্মও বলা হয় (জ্যোতি:পাল মহাস্থবির ৪৮)

ফল প্রদানের স্থানানুসারে কর্ম চার প্রকার। যথা- ১. কামাবচর অকুশল কর্ম, ২. কামাবচর কুশল কর্ম, ৩ রূপাবচর কুশল কর্ম এবং ৪. অরূপাবচর কুশল কর্ম।

১. কামাবচর অকুশল কর্ম

'কামাবচর' শব্দের অর্থ কাম্য জগতের এগার প্রকার ভূমিকে কামাবচর বা কামভূমি বলা হয়। এগার প্রকার ভূমি হলো- ছয়টি দেবভূমি, একটি মনুষ্যভূমি, এবং চারটি অপায়ভূমি। কামাবচর অকুশল কর্ম হলো যে কর্মসমূহ সত্ত্বদের চতুর অপায়ে জন্ম গ্রহণে সহায়ক হয় (জগন্নাথ বড়ুয়া ২৪৪) ।

২. কামাবচর কুশল কর্ম

যে কর্মসমূহ সত্ত্বদের চতুর অপায় ব্যতীত বাকী সাত প্রকার কামাবচর ভূমিতে জন্ম গ্রহণে সহায়ক হয় তাই কামাবচর কুশল কর্ম (জগন্নাথ বড়ুয়া ২৪৪) । কুশল কর্মও দশপ্রকারে ত্রিদ্বারে সম্পাদিত হয় এবং দেবমনুষ্যলোকে সুখ ভোগ করে।

৩. রূপাবচর কুশল কর্ম

রূপাবচর কুশল কর্ম মনোকর্ম। যে কর্মসমূহ সত্ত্বদের কামভূমির উর্ধ্বে ষোল প্রকার রূপব্রহ্মলোকে ৬ জন্ম গ্রহণে সহায়ক হয়, তাই রূপাবচর কুশল কর্ম (জগন্নাথ বড়ুয়া ২৪৪) । এ কর্ম শুধু চিত্ত বা মনো গঠিত। অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে এ কর্ম সম্পাদিত হয়।

৪. অরূপাবচর কুশল কর্ম

উত্তোরত্তর সাধনার ফলে সত্ত্বদের রূপলোকের উর্ধ্বে অরূপলোকে অর্থাৎ চার অরূপভূমিতে ৭ জন্ম গ্রহণে সহায়ক হয়, তাকে অরূপাবচর কুশল কর্ম বলে। এটি মনোকর্ম।

কর্মের সাথে জন্মের সম্পর্ক

জন্মাবধি মানুষ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দ্বার দিয়ে কখনো সৃষ্টি করছে কুশল কর্ম কখনো বা অকুশল কর্ম। আর এ দ্বিবিধ কর্মের মধ্যে শক্তি যেদিকে বেশী সেদিকে সত্ত্বগণ জন্ম গ্রহণ করে। অর্থাৎ যদি কুশল কর্মের প্রভাব বেশী হয় তাহলে কুশল কর্মের তারতম্য অনুযায়ী মনুষ্যলোকে, স্বর্গে কিংবা ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে। আর যদি অকুশল কর্মের প্রভাব বেশী হয় তাহলে নিম্ন থেকে নিম্নতম স্থানে যথাক্রমে তির্যক, প্রেত, অসুর ও নিরয়ে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম হচ্ছে ভবিষ্যৎ জন্ম নির্ধারণের নিয়ামক। তাই সত্ত্বদের কুশলকর্ম সম্পাদন করা উচিত যাতে পরবর্তী জন্ম সুখের হয়।

উক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কর্মের সাথে জন্মের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মানুষের কুশলকর্ম সম্পাদন করে পুণ্য সঞ্চয় করা উচিত যাতে পরবর্তী জন্ম সুখের হয়।

কর্মবাদের শিক্ষা

বৌদ্ধ কর্মতত্ত্ব মানবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেয়। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্মোক্ত শিক্ষাসমূহ গ্রহণ করতে পারি।

১. আত্মনির্ভরশীলতা - কর্মবাদ আত্মনির্ভরশীল হতে এবং আপন কর্মের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করতে শিক্ষা দেয় । পরনির্ভরশীলতা ও পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার করতে শেখায়। কারণ এই মতবাদ অনুযায়ী স্বীয় ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের সৃষ্টিকর্তা নিজেই। বুদ্ধ বলেন,

অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরোসিয়া ?

অত্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং *(ধম্মপদ* ১৬০) ।

নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা। অপর কোনো ত্রাণকর্তা পৃথিবীতে নেই। নিজেকে সংযত করার মধ্য দিয়ে দুর্লভবস্তু অর্থাৎ পরম সুখ নির্বাণ লাভ সম্ভব। জগতে এমন কোনো গোপন স্থান নেই যেখানে আত্মগোপন করে অন্যায় কর্মের ফল ভোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে *(ধম্মপদ* ২৮৮)। বুদ্ধ অন্তিম শয্যায় শায়িত হয়েও মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টি স্মরণ করে দিয়ে বলেন,

অত্তদীপ বিহরথ, অত্তসরণা অনঞ্ঞ সরণা (ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির ৫৫) ।

- নিজের জ্ঞানরূপ আলোতে বিহার করতে হবে; আত্ম শরণই শ্রেষ্ঠ শরণ। যেহেতু এ দর্শন মতে পুরস্কার বা শাস্তিদাতা বলতে কেউ নেই, স্বকৃত কর্মের ফল ইহজীবনে এবং পরজন্মে নিজেকে ভোগ করতে হয়; সুতরাং এই তত্ত্ব আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়।

২. আত্মবিশ্বাস - কর্ম, কর্মফল এবং জন্মান্তরে আত্মবিশ্বাসী হতে শিক্ষা দেয়। কারণ মন্দ কর্ম করে কারো কাছে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পাওয়া যায় না কিংবা মন্দ কর্মের ফলভোগ থেকে উদ্ধার করা এমনকি পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা, বন্ধু- বান্ধব, জ্ঞাতি-মিত্র কারো পক্ষে সম্ভব নয় (*ধম্মপদ* ২৮৮)। স্বকৃত কর্মের ফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়। মন্দ কর্ম সম্পাদনকারীর আত্মবিশ্বাস হয় নড়বড়ে। পক্ষান্তরে ভালো কর্ম সম্পাদনকারীর আত্মবিশ্বাস হয় দৃঢ় ; যে কোনো পরিস্থিতিতে মানসিক মনোবল থাকে সুদৃঢ়। এ দর্শনের মাধ্যমে সৎ কর্ম সম্পাদনকারী আত্মবিশ্বাসী হতে পারে।

৩. সংযমতা অবলম্বন - কর্ম ও কর্মফল এবং কর্মফলের কারণে জন্মান্তর যেহেতু অবশ্যম্ভাবী সেহেতু মানুষকে আত্ম সংযমের শিক্ষা দেয়। কারণ সংযমতা অবলম্বনের মাধ্যমেই মানুষ পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সৎ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এতে নিজের ও চারপাশে বসবাসরত সবার উপকার ছাড়া ক্ষতি হয় না। বুদ্ধ বলেন, সাধু ব্যক্তি কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত, চিত্তে সংযত, তিনি সকল ক্ষেত্রে সংযত। সর্বদা সংযত সাধু সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভে সমর্থ হন (*ধম্মপদ* ৩৬১)।

৪. সর্বজীবে দয়াবান - কর্মতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ জীবে দয়ালু হতে শিক্ষা দেয়। জীব জগতে প্রত্যেক জীবই নিজ প্রাণকে সর্বাধিক ভালোবাসে ; এটা জীবের স্বভাব। প্রত্যেকের কাছে নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছুই নেই। কাজেই নিজের জীবনকে প্রত্যেকে যেমন ভালোবাসে ; সর্বতোভাবে রক্ষা করে তেমনি জগতের অপরাপর প্রাণিরাও তাদের স্ব স্ব জীবনকে ভালোবাসে ও রক্ষা করার চেষ্টা করে। যারা কর্ম ও কর্মফলে এবং জন্মান্তরে বিশ্বাসী তারা সকল জীবের প্রতি নিজ প্রাণের মতো মমতা পোষণ করে। কেননা তারা অবগত আছে যে, সর্বকর্মের ফল ইহ কিংবা পর জীবনে ভোগ অবধারিত।

৫. দায়িত্বশীলতা - বৌদ্ধ কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ মানুষেকে দায়িত্বশীল হতে শিক্ষা দেয়। কর্ম এবং কর্মের ফল ভোগ করার জন্য যেহেত মানুষ পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে এবং তার ইহজন্মে কৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হবে, সে কারণে সে অবশ্যই তার কাজকর্মে দায়িত্বশীল হবে। দায়িত্বে সযত্ন দৃষ্টি বা সতর্কতা না থাকলে তার দ্বারা অন্যায় কর্ম সাধিত হতে পারে। একারণে কর্ম এবং জন্মান্তরে বিশ্বাসী মানুষ স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না ; দায়িত্ব পালনে যত্নশীল হন।

৬. মনুষ্যত্ববোধ অর্জন - মানুষের দুটি চরিত্রগত দিক আছে, একটি মানবিক অন্যটি পাশবিক। সকল মানুষের চরিত্রে এ দুটি দিক বিরাজ করে। পাশবিক চরিত্র মানুষকে পশুর মতো হিংস্র করে আর মানবিক চরিত্র মানুষের মনুষ্যত্ব বোধকে জাগ্রত করে। পাশবিক চরিত্র স্বভাবজাত এবং মনুষ্যত্ব বোধ অর্জন করার জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনার, প্রয়োজন উদ্যমের। কেননা মনুষ্যত্ব অর্জন আত্মপ্রচেষ্টা ব্যতীত অসম্ভব। এই মনুষ্যত্ব অর্জনে বুদ্ধ যে দশবিধ কুশল কর্মের বর্ণনা করেছেন তা অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। দশবিধ কুশল কর্ম নৈতিক চরিত্র গঠনের মূল ভিত বললে অত্যুক্তি হবে না। এজন্য কায়িক অনাচার দমন করে কায়ে সংযত হতে হবে, বাচনিক দুর্বাক্য পরিহার করে সুবাক্যভাষী হতে হবে এবং মানসিক কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করে সুমনোবৃত্তির অধিকারী হতে হবে। তাহলে মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জন হবে।

৭. সমাজ উন্নয়ন - মানষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানষ বাঁচতে পারে না। আবার মানুষ ছাড়াও সমাজ হয় না। মানুষ এবং সমাজ একে অন্যের পরিপূরক। তবে সমাজের সার্বিক উন্নয়নে মানুষের ভূমিকা অবর্ণনীয়। মানুষেরাই পারে একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে। আর এজন্য মানুষকে বুদ্ধোপোদিষ্ট সুকর্মের (দশবিধ কুশল কর্ম) দ্বারা গঠনমূলক, সংস্কারমূলক, উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে। এসুকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মউন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নও হবে। সমাজে খুনাখুনি, হানাহানি, চুরি, ধর্ষণ প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

উপযোগিতা - বৌদ্ধ কর্মতত্ত্ব বা কর্মবাদ মহামানব গৌতম বুদ্ধের একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত প্রাণি জগত কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ এবং কর্ম বিপাকে আবর্তিত। কর্ম বিপাকের গতিধারা কোনোভাবেই বত্যয় ঘটে না। এ বিষয়টি সম্যক উপলব্ধ হলে কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষ কোনো প্রকার অপকর্ম করতে পারবে না।

বৌদ্ধ কর্মতত্ত্ব দুঃখের উন্মোচন করে, সাধারণ জ্ঞানে যাকে ভাগ্য বা নিয়তি বলা হয়, এই নিয়তিকে খণ্ডণ করে এবং সর্বোপরি মানুষে মানুষে যে ভিন্নতা তার রহস্যও উদঘাটন করে। মানুষ প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ ভাগ্য নিয়ন্তা। কর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেয়, কর্মই আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং কর্মই আমাদের ধ্বংস কর্তা। আমরা নিজেরাই রচনা করি আমাদের স্বর্গ-নরক (চৌধুরী, ১৪৭)। তাই আমাদেরকৃত প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের পূর্বে সচেতন হয়ে সম্পাদন করতে হবে। তাহলে পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে শান্তি বজায় থাকবে এবং মৃত্যুর পর পারলৌকিক সুখ লাভ করা যাবে।

উপসংহার

কর্মবাদের সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। ভালো, মন্দ, কুশল অকুশল কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। কর্মবাদ হচ্ছে জন্মান্তর গ্রহণের মূল সূত্র। কর্ম হচ্ছে এমন একটি শক্তি যার কারণে কর্মের ভালো বা মন্দ বর্তমান জীবনে অথবা পরবর্তী জন্মে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কর্মের এই অমোঘ নিয়ম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কর্মবাদের ওপর ভিত্তি করে বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ প্রসারিত হয়েছে। কর্মের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত , অর্থাৎ দুঃখ নিরোধ প্রতিপদ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে তৃষ্ণা ও অবিদ্যার উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে ভালো-মন্দ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়। তাই কর্মবাদ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে একই সূত্রে গাথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লোভ, দ্বেষ, মোহযুক্ত কর্মের দ্বারা সংস্কারের সৃষ্টি হয় এবং জন্মান্তর ঘটায়। কর্মের কারণে মানব আসবমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হতে থাকে। বর্তমান ও অতীত কর্ম দ্বারা জীবন আবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও মানব স্বীয় ইচ্ছাশক্তি বলে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা তথা আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে কর্মবন্ধন ছিন্ন করে বিমুক্তি লাভ করতে পারে। তাই আমাদের উচিত পুরাতন কর্মের ক্ষয় করে, ভালো কর্ম সম্পাদন করে মনকে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা, আনাপনা স্মৃতিভাবনা দ্বারা সর্বদা সচেষ্ট রাখা। উঠতে, বসতে, গমনে ও শয়নে যতক্ষণ ঘুম না আসে সবসময় নিজের মত করে অন্যের সুখ ও মঙ্গল কামনা করা।

টীকা

১। মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কং'ব বহতোপদং।

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং সুখমণ্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী। *ধম্মপদ (*পালি), গাথা নং- ১,২

তথ্যসূত্র

জগন্নাথ বড়ুয়া । *গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন ও ধর্মদর্শন*। নবরাগ প্রকাশনী, ২০১৪।

জ্যোতি: পাল মহাথের। *কর্ম্ম তত্ত* (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৭৯।

জিনবংশ মহাস্থবির। *সদ্ধর্ম-রত্ন-চৈত্য*, The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation ,১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

ধর্মাধার মহাস্থবির, *মিলিন্দ প্রশ্ন*, (বঙ্গানুবাদ) ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৭৭।

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির । *মধ্যম নিকায়* (অনুবাদ), উপালি সূত্র (৫৬) , ১৯৫৬।

প্রজ্ঞাদশী ভিক্ষু, *অঙ্গুত্তর নিকায়* (অনুবাদ), পঞ্চম খণ্ড, রাজবন বিহার, ২০১৫।

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু। *সংযুক্ত নিকাযো* (পালি), পঠমো ভাগো । ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৩।

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু। *অঙ্গুত্তর নিকায়* (পালি), ততিযো ভাগো (নিব্বেধিকসুত্তং) , ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৩।

ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির। *নেত্তিপকরণ*, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১১।

রণধীর বড়ুয়া (অধ্যাপক)। *মহামানব বুদ্ধ দ্বিতীয় পর্ব বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন (তৃতীয় প্রকাশ)*। বুড্ডিস্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ, ২০০৭।

রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত মহাস্থবির । *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, ১৯৪১।

রেবতপ্রিয় বড়ুয়া (ড.)। *বিশুদ্ধিমাগ*, (অনুবাদ) এলিট কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স, ২০১৫।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। *অভিধর্ম-দর্পণ* (অখণ্ড সংস্করণ)। মহাযোগী ট্রাষ্ট বোর্ড, ১৩৯৮।

শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি। *অভিধম্মার্থ-সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্ত-সার অভিধর্ম্ম* (অনূদিত ও সম্পাদিত) ১৯৪০।

শ্রী বেণীমাধব বড়ুয়া (অনু)। *মধ্যম-নিকায়*। কলিকাতা: যোগেন্দ-রূপসী বালা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০।

শুভ্রা বড়ুয়া । *বৌদ্ধ কোষ* (দ্বিতীয় খণ্ড) পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭-৯৮, শুভ্রা বড়ুয়া। *বৌদ্ধ কোষ (চতুথ খণ্ড)*। পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭-৯৮।

সুকোমল চৌধুরী (ড)। *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* । জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০৯৭।

সুমঙ্গল বড়ুয়া। *অঙ্গুত্তর নিকায় (*অনুবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ), প্রথম খণ্ড। বনভন্তে প্রকাশনী, ২০০৪।

সুমঙ্গল বড়ুয়া। *সুত্ত পিটকের অন্তর্গত ধম্মপদ* (গাথা, অনুবাদ ও কাহিনী সম্বলিত) । রাজবন বিহার, ২০১৬।

Pali-English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers PVT. Ltd,54, 1993.

The path of Purification (Visuddhimagga). Translated by Nonamoli Bhikkhu, 4th ed., Buddhist Publication Society, Kandy, Srikanka, 2010.

F.L. woodward, M.A; *Gradual Sayingi*(trans). London:The pali Text Society, 2006.

Ledi, Sayadow; *The Manual of Buddhism*. Rangoon: Uninon Buddha Sasana Council, 1965.

Mahathera, A.P. Buddhadatta; *Concise Pali-English Dictionary* (Rep) Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1997.

Payutto, Bhikkhu P.A. *Good, Evil and Beyond Kamma in the Buddhist Teaching*. Thailand : Buddhadhamma foundation, 1993.

Peter, Santina, D. *The Tree of Enlightenment.* USA: Chico Dharma Study Foundation, 1997.